শান্তি নিকেতন

লেখিকা ও প্রকাশক

প্রীতি

শান্তি নিকেতন

জন্মের পর থেকেই নানুগৃহে বড় হয়েছি।নানি গৃহ না বলে নারিগৃহ বলা যায় কেননা উনিই ছিলেন বাড়ির কর্তা।

বয়স যখন ছয় তখন নানু মারা যান। উনি বাড়ির কর্তা এবং একজন রাগী প্রকৃতির মানুষ হওয়ায় বাড়ির প্রতিটা সদস্য ওনাকে ভয় পেতো, সে এক অসম্ভব ভয়। কিন্তু উনার আমার প্রতি ছিল সদা কোমল আচরণ কেননা জন্মের পর থেকে বাবা, মার আদর পেয়ে উঠিনি। নাহ, ওনারা কেও মারা যাননি। দুজনে ব্যস্ত প্রকৃতির মানুষ হওয়ায় নানুই আমাকে বড় করে তুলেছেন। তবে এর একটা খারাপ প্রভাব এইযে আমি না চাইতেও অনুভূতিহীন মানুষ হিসেবে বড় হয়েছি, ঠিক অনুভূতিহীন নয় অনুভূতি বোঝায় ছিলাম অক্ষম। ভালো মন্দ বোঝবার বোধশক্তি হয়ে উঠেনি। নানু আমাকে আদর স্নেহ করলেও তার মর্মার্থ বুঝে উঠবার আগেই উনাকে যেতে হলো পরলোকে। সেদিন বাড়ির সবাই কাঁদলেও আমার কোনো অনুভূতি অনুভব হলোনা। কষ্ট হচ্ছিল বোধহয় কিন্তু তা বোঝবার বোধশক্তি ছিল না তখন, তাই কোনো অনুভূতিই অনুভব হচ্ছিল না।

ও হ্যা সেদিন আমার বাবা মাকে আমি প্রথমবার দেখতে পাই। অতঃপর অনেক কিছুই হলো আমার সাথে কিন্তু সব কিছু আমার কাছে ছিলো ঝাপসা। তবে শেষটা হলো এই যে বাবা মা সিদ্ধান্ত নিল আমি আমার বাবা মার কাছেই থাকবো এখন থেকে। খুশি অনুভব হচ্ছিল এইভেবে যে এবার আমি আমার বাবা মার কাছে থাকবো, এক সঙ্গে খেলা করবো।
এরকম আরো কতো কল্পনা মনে এসে বসেছিল। আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো এক প্রকাণ্ড বাড়িতে। বাবা মাকে দেখার পর এই বাড়ি দেখার পর অদ্ভুত অনুভূতি কাজ করচ্ছিলো। এরকম অনুভুতি আগে কখনো অনুভব হয়নি। আমার গোটা ছয় বছরে এই অদ্ভুত অনুভূতি আগে কখনো হয়নি। একেই বোধহয় মানুষ আনন্দ বলে। বাবা মার সাথে থাকার আনন্দ। সে যাই হোক গল্পে ফিরি।

সে বাড়িতে আমাকে নিয়ে গেলেন ওনারা এবং আমাকে একটা ঘরে রেখে আসা হলো। অতঃপর সেদিন তাদের আর দেখা মেলেনি। পরপর কয়েকবার দরজায় কড়া নাড়া হয় আর আমি আশা নিয়ে তাকিয়ে দেখি অন্য কেও। যে বা যারা এলো তাদের আমি চিনি না। তবে সময়ের সাথে সাথে তারাই আপন হয়ে উঠলো। পৃথিবীতে রক্তের সম্পর্কের থেকে পর মানুষরাই সবচেয়ে বেশি আপন হয়ে উঠে।

বাবা, মার সাথে দেখা করার আগ্রহে সারাদিন অপেক্ষা করতে করতে দিনশেষে তাদের দেখা কখনো মিলতো আবার কখনো বা মিলতো না। এভাবে ধীরে ধীরে সে আগ্রহ হারিয়ে প্রকৃতির নিয়মে বড় হতে লাগলাম।

প্রথম দিকে আমাকে বাড়িতে হোম স্কুল দিলেও কলেজে উঠার সময় হলে আমি বাহিরে পড়ার আবদার করলাম এবং শেষপর্যন্ত তারা রাজি হলো বাহিরে কলেজে দিতে। সে এক অদ্ভুত সুন্দর শহর, মানুষ। বরাবর সবই অদ্ভুত লাগে শুরুর দিকে। কেননা জীবনে তখনই প্রথম ছিল বাহিরের জগৎ দেখা।

বেশ তৃপ্তি কাজ করছিলো। কেননা সেই অন্ধকার কারাগার থেকে অবশেষে বের হতে পেরেছি। অনুভব হচ্ছিল আমার নতুন করে জন্ম হয়েছে। বাহিরের দুনিয়ায় বিচরণ শুরু করলাম। জীবনের অনেকটা সময় একাকিত্বকে সঙ্গি বানানোর ফলে প্রথম দিকে মানুষের সাথে মিশে উঠতে পারছিলাম না। কথায় ছিল অস্পষ্টতা এবং জড়তা। সবাই আমার বিলাসবহুল জীবন কাটানো দেখলেও কেও আমার সাথে মিশতো না। কেননা আমি আনন্দ কিংবা দুঃখ করতে জানতাম না, কীভাবে কথা বলতে হয় জানতাম না। ফলে সবাই আমার থেকে পালিয়ে বেড়াতো। এভাবেই কাটতে থাকলো কলেজ জীবন পড়াশোনা আর একা ঘুরাফেরা নিয়ে। সারাদিন পর ঘরে ফিরে ভালোই লাগতো। নিজের ঘর, আমি শুধু আমি। তবুও কোথাও না কোথাও ঐই একাকিত্ব আমাকে নিঃশেষ করা শুরু করেছিলো।

অতঃপর সিদ্ধান্ত নিলাম একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখালে হয়তো সব সমাধান হবে। যেই ভাবা সেই কাজ। কিছুদিন পর গেলাম একজন সাইকিয়াট্রিস্ট এর কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে। তবে গিয়ে অবাক হলাম আমার সাইকিয়াট্রিস্ট কোনো বৃদ্ধ প্রবীণ নন। এতদিন ধারণা ছিল সাইকিয়াট্রিস্টরা সব বয়স্ক হয় তাই অভিজ্ঞ হয়। কিন্তু আমার সাইকিয়াট্রিস্ট আমার থেকে খুব খুব জোর ৬-৭ বছরের বড়ো।

গেলাম এবং উনাকে ডাঃ বলে ডাকতেই আমাকে বলল

"আমি নেহাল, আমাকে নেহাল বলেই ডাকো, তোমাকে এখানে ট্রিটমেন্ট দিতে নয় বরং তোমার সমস্যা সমাধান করতে বসেছি। তুমি অসুস্থ নও যে ট্রিটমেন্ট লাগবে।"

শুনে বেশ অবাক হলাম।

"বন্ধু! আর আমি!"

যাই হোক প্রথম সেশন টায় তেমন কোন প্রশ্নই জিজ্ঞেস করেননি ডাঃ নেহাল। আর আমি নিজেও জানিনা আমার সমস্যা কি তাই আমি নিজেও কিছু বলতে অক্ষম ছিলাম। সময় শেষ হবার পর ডাঃ নেহাল আমাকে যেতে বলে এবং সামনের সপ্তাহে আবার দেখা করতে বলে। কথা মত আবার গেলাম এভাবে ছয় সাতটা সেশন শেষ হল এবং আমি তার সাথে মিশতে শুরু করলাম।

যাই হোক প্রথম সেশন টায় তেমন কোন প্রশ্নই জিজ্ঞেস করেননি ডাঃ নেহাল। আর আমি নিজেও জানিনা আমার সমস্যা কি তাই আমি নিজেও কিছু বলতে অক্ষম ছিলাম। সময় শেষ হবার পর ডাঃ নেহাল আমাকে যেতে বলে এবং সামনের সপ্তাহে আবার দেখা করতে বলে। কথা মত আবার গেলাম এভাবে ছয় সাতটা সেশন শেষ হল এবং আমি তার সাথে মিশতে শুরু করলাম।

ডাঃ নেহাল এর পরিবর্তে তাকে নেহাল ডাকা শুরু করলাম এবং নিজের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করতে শুরু করলাম নতুন নতুন অনুভূতি ভাবতে শুরু করলাম। আমার মধ্যকার জড়তা কাটতে লাগলো। জীবনকে নতুনভাবে দেখতে শুরু করলাম। তবে সব কিছুর মধ্যে সবথেকে আগ্রহী বস্তু হয়ে উঠল নেহাল। তার সাথে সেশনের জন্য পুরো সপ্তাহ অপেক্ষায় থাকতাম। এভাবে অনেকটা সময় কেটে গেল।

কলেজ শেষ হলো ইউনিভার্সিটিতে উঠলাম। বাড়ির কথা খুব একটা মাথায় আসতো না। নেহালের সাথে পরিচয় গভীর হতে লাগলো সময়ের সাথে সাথে। অনেকটা সময় বাড়ি না ফেরায় মা একদিন আমাকে দেখতে আসলো কিন্তু আমি ছিলাম নেহালের সাথে আর তাছাড়া মার সাথে দেখা করার ইচ্ছাটাও তেমন না জাগায় সেদিন দেখা হয়নি আর। কিন্তু দুদিন পর বাধ্য হয়ে বাড়ি যেতে হয় মা অসুস্থ হয়ে পড়ায়। গেলাম সে বার বাড়ি।

একদুদিন থাকবো এই ভেবে গেলেও বেশ কয়দিন থাকা হয়। সেইবার মাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছিলাম। মনে হচ্ছিল এ যেন আমার জীবনের এমন এক অধ্যায় যা আমি না পড়েই সামনের অধ্যায়ে চলে গিয়েছি। কিন্তু প্রকৃতি তা হতে দেয়নি। আবার ফিরিয়ে এনেছে সেই না পড়া অধ্যায়ে।

খেয়াল করলাম মার গায়ে অসংখ্য পোড়া দাগ। যা আমার সে বয়সে কোনদিন দেখিনি। তিনি সব সময় পুড়ো গা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতেন হয়তো এই কারণেই। তখন বাবা-মার প্রতি এতই অভিমান ও অভিযোগ ছিল যে কখনো কোন প্রশ্নই জাগেনি।
মা বেশি অসুস্থ থাকায় সেবারের যাত্রায় আর বাড়ি ফেরেনি। কিন্তু আমার মনে তো ছিল অজস্র প্রশ্ন যে প্রশ্নের উত্তর মা বাদে আর কেউ দিতে পারবে না। মাকে বিদায় দেবার মুহূর্তে আমার কান্না পাচ্ছিল। কী অদ্ভুত...

আমার এই ছোট জীবনে সেবারই প্রথম কারো জন্য এতটা কষ্ট অনুভব হচ্ছিল এবং কান্না পাচ্ছিল। সেদিন রাতে মায়ের ঘরেই ছিলাম। নেহাল একবার ফোন করেছিল মায়ের কথা জিজ্ঞেস করতে। আমি "ওনি আর নেই" বলে কেটে দিয়েছি। কথা বলার আগ্রহ ছিল না কোনো। সে রাতে মার ঘরে বসে ওনার পড়া বইগুলো দেখছিলাম। এত বই মনে হচ্ছিল পৃথিবীর সব বই তার ঘরে। বই দেখতে দেখতে ঘন্টা দুয়েক চলে যাবার পর খেয়াল করলাম একটা ডায়েরি যা বইয়ের মলাটে মুড়ানো। দেখে বুঝবার উপায় নেই এটা ডায়েরি।

মনে হয় যেন কোন বিদেশি লেখকের বই। ডায়েরী খুললাম এক পেইজ দুই পেইজ করে যেতে যেতে দেখলাম আমাকে নিয়ে লেখা। আগ্রহ বেড়ে গেল আমার আরো।

"আরে এ যে আমাকে নিয়ে লেখা তাও আবার মায়ের ডায়েরীতে"। আমার মতো তুচ্ছ একজন মানুষকে নিয়ে কেও কিছু লিখবে এ আমার কল্পনাতীত ছিল।

আমাকে নিয়ে লেখা অংশটুকু পড়ে বুঝতে পারলাম আমি যেমন ছোটবেলায় মাতৃ স্নেহের জন্য ছটফট করেছি আমার মাও তেমন আমাকে বুকে টেনে নেওয়ার জন্য ছটফট করেছে। কিন্তু প্রতিনিয়ত ঝগড়া আর মারধর খাওয়ার পর দগ্ধ দেহ নিয়ে আমার সামনে সে যেতে পারত না। তবে আমাকে তিনি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করতেন। যেদিন মা আমার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন সেদিন মা আমাকে সব বলতে গিয়েছিলেন কিন্তু আমি তাকে দেখা না করে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। আমার বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন যা মা মানতে পারেনি। অর্থ বৃত্তের অহংকার বাবাকে অন্ধ করে দিয়েছিল। ফলে মাকে মানুষ হিসেবে গণ্য করত না বাবা। আর আমি সেই বাবার কাছেই বাবার বাড়িতে মাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম সেদিন।

ডায়েরীর শেষ পৃষ্ঠায় মা আমাকে লিখেছেন

"আমি জানি তুমি ডায়েরীটা পড়েছো। আর আমি এটাও জানি আমার প্রতি তোমার বড্ড অভিমান এবং অভিযোগ। তবে আমিও তোমার মতোই দিনশেষে একজন মানুষ। দায়িত্ব আমার কাঁধে পড়লেও আমি তা কখনো পালন করতে পারিনি, যে ব্যাথা আমাকে তিলে তিলে গ্রাস করেছে। তবে আমি তোমাকে আমার সন্তান হিসেবে অনেকটা ভালোবাসি। এ জগতে তা প্রকাশে আমি ব্যর্থ হয়েছি। তোমার মাকে মাফ করে দিয়ো। তবে যে গৃহ আমার নয় সে গৃহযে তোমার সেইটা আমি কীভাবে তোমাকে অনুভব করাতাম!!"।

এটা পড়ার পর মায়ের জন্য পানিতে চোখ কেমন ঝাপসা হয়ে গেল, কিছু বুঝতে পারছিলাম না। নিজের প্রতি নিজের ঘৃণা হচ্ছিল। আমি কেন কখনো কিছু জানতে চেষ্টা করিনি এই ভেবেই ঘৃণা হচ্ছিল। মা বাড়ি থেকে না ফেরার দেশে চলে গিয়েই বোধহয় অবশেষে তার বাড়ি পেয়েছে।

আমি সেই ডায়েরী নিয়ে সেই রাতেই বাবার সেই অন্ধকার বাড়ি থেকে আমার বাড়ি ফিরেছি। আমার বাড়ি, আমার ঘর। সে রাতে ঘুম হলো না এবং সকাল হতে না হতেই ইউনিভার্সিটিতে চলে গেলাম। সেখানে গুটিকয়েক বন্ধু হয়েছিল। কেননা এখন আমি অনুভূতি প্রকাশ করতে পারি, হাসতে পারি, হাসাতে পারি, কষ্ট পেতে জানি এবং অন্যের দুঃখে পাশে থাকতে জানি। এভাবেই কেটে যাচ্ছিল সময়।
চার বছরের ইউনিভার্সিটি এর শেষ সেমিস্টারে নেহাল বিয়ের জন্য প্রপোজ করার হ্যাঁ বলে দিয়েছিলাম। চার বছরের পুরোটা সময় যে আমাকে বাঁচতে শিখিয়েছে, নিজেকে আবিষ্কার করতে শিখিয়েছে তার সাথে বাকিটা জীবন পার করাই যায়।

ইউনিভার্সিটি শেষ হতেই বিয়ের পিরিতে বসলাম। চার বছরের গড়ে তোলা আমার ঘরের মায়া ত্যাগ করে নেহালের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। নতুন বাড়ি নতুন ঘর নতুন মানুষ। সব নতুন সব ভিন্ন। সময়ের সাথে সাথে সে বাড়িকে নিজের ভেবে মায়ায় গড়তে লাগলাম। বছর কয়েক পার হওয়ায় পাক্কা গৃহিণী হয়ে উঠেছি। স্বপ্ন ছিল আমি মা হবো। যে মা তার সন্তানকে বড় করবে নিজ হাতে।

আমাদের একটি ছেলে সন্তান হলো। এবছরের ১৮ফেব্রুয়ারি তার বয়স এক বছর পূর্ণ হবে। ভেবেছিলাম নেহাল আর আমি দুজনে মিলে তার জন্মদিন পালন করব। কিন্তু নেহালের কাজের চাপে তাকে বিদেশে যেতে হয়েছে গতকালকে। এখন বাড়িতে আমার ছেলের শুধু আমিই আছি। খালাকে দিয়ে বাড়ির সব কাজ করিয়েছি, বাড়ি একদম সুন্দর করে সাজিয়েছি মোমবাতি ও প্রদীপ দিয়ে। ছেলের জন্মদিন বলে কথা। বর্তমানে যদিও নেহাল কাজের চাপে খুব একটা পরিবারকে সময় দিতে পারে না কিন্তু আমার স্বপ্ন আমার ছেলেকে আমি আমার মত করে বড় করবো। আমি চাইনা আমি যেভাবে বড় হয়েছি আমার ছেলেও সেভাবে বড় হোক।

খুব তোরজোর করে নিশানের জন্মদিন পালন করলাম। কিন্তু পরদিন সকালে নিশানের শরীর হঠাৎ খারাপ করার তাকে আমি হাসপাতালে নিতে হলো। ডাক্তার জানায় ওর হার্টে ছিদ্র থাকায় এমনটা হয়েছে। অপারেশন এর জন্য বাহিরের দেশে নিলে ভালো হয়। কেননা ওর বাঁচাও সম্ভাবনা খুবই কম। নিশানের অপারেশনের জন্য তাকে বিদেশ নিয়ে যাই আমি একা নেহালের পৌঁছতে অনেকটা দেরি হবে তাই। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিণতিতে আমার ছেলে আর আমার সাথে বাড়ি ফেরেনি। নিশান আর আমার কোলে বাড়ি ফেরেনি। প্রকৃতি যেন মানুষের সবচেয়ে কাছের কিছুই ছিনিয়ে নিতে প্রস্তুত থাকে সবসময়।

একা শূন্য হাতে বাড়ি ফিরলাম। আমার আদর্শ মা হওয়ার স্বপ্ন সেই হাসপাতালে ই রেখে আসলাম। হয়তো স্বপ্ন আর নিশানের সাথে আমিও সেই হাসপাতালেই থেকে গিয়েছিলাম শেষ পর্যন্ত। বাড়ি কেমন যেন প্রাণহীন হয়ে পড়েছে। নেহাল সবকিছুর জন্য আমাকে দায়ী মনে করে। নেহাল নিশানের মৃত্যুর পর একবার বাড়ি এসেছিল আর আসেনি। পুরো বাড়িতে শুধু আমি আর নিশানের স্মৃতি।

বাড়ি! আচ্ছা এটাকে কিভাবে বাড়ি বলি? যেখানে এসে মানুষ দিন শেষে সকল দুঃখ কষ্ট ভুলে যায় প্রশান্তি মেলে তাকেই তো শান্তি নিকেতন বা বাড়ি বলে।

কিন্তু আমার তো এখানে প্রশান্তি মেলেনা। আমিতো এখানে আমাকে খুঁজে পাইনা। তাহলে আমার শান্তিনিকেতন টা কোথায়??

তাহলে কি আমার মার মত আমারও এ জন্মে শান্তিনিকেতন পাওয়া হলোনা!

~সমাপ্ত~

প্রিতি.পাতা.বাংলা

লেখিকা ও প্রকাশক
আয়েশা সিদ্দিকা প্রিতি

লেখিকা ও প্রচ্ছদ কর্তৃক সর্বাত্মক সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশকালঃ মার্চ ২০২৬